জাতীয় খাদ্যনীতি, ২০০৬

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

১৪ই আগষ্ট, ২০০৬

সূচি

ক. পটভূমি - ০১

খ. খাদ্যনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - ০২

গ. সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার ধারণাগত কাঠামো - ০২

ঘ. জাতীয় খাদ্যনীতির উদ্দেশ্য, পদ্ধতি কৌশল এবং কার্যাবলীর বিবরণ - ০৩

উদ্দেশ্য-১.০. নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ - ০৩

কৌশল-১.১. দক্ষ ও টেকসইভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি - ০৩

১.১.১. কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ - ০৩

১.১.২. পানি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার - ০৩

১.১.৩ কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা এবং তার দক্ষ ব্যবহার - ০৩

১.১.৪. কৃষি বহুমুখীকরণ ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি এবং গবেষণা - ০৪

১.১.৪.১. খাদ্যশস্য বহির্ভূত (শাকসব্জি, তৈলবীজ, ডাল এবং ফলমুল) ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি - ০৪

১.১.৪.২. শস্য বহির্ভূত (পশুসম্পদ ও মৎস্যসম্পদ) কৃষি উন্নয়ন - ০৪

১.১.৫. কৃষিঋণ - ০৪

কৌশল-১.২. দক্ষ খাদ্যবাজার - ০৫

১.২.১. বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন - ০৫

১.২.২. বেসরকারী খাদ্য ব্যবসা উৎসাহিতকরণ - ০৫

১.২.২.১. খাদ্যদ্রব্যের বেসরকারী গুদাম এবং চলাচল ব্যবস্থা উন্নয়ন - ০৫

১.২.২.২. খাদ্য ব্যবসায় উদার ঋণ - ০৫

১.২.৩. বাণিজ্য সহায়ক আইন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ - ০৫

১.২.৪. পূর্ব-সতর্কীকরণ ও বাজার তথ্য উন্নয়ন এবং প্রচার - ০৬

কৌশল-১.৩. মূল্য স্থিতিশীলকরণে খাদ্যশস্য বাজারে অবিকৃত সরকারী হস্তক্ষেপ - ০৬

১.৩.১. অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনে মূল্য সহায়তা - ০৬

১.৩.২. সরকারী খাদ্যশস্য মজুদ - ০৬

১.৩.৩. ভোক্তাদের মূল্য সহায়তা - ০৭

উদ্দেশ্য-২.০ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এবং খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি - ০৭

কৌশল-২.১ তাৎক্ষণিক অভিঘাত ব্যবস্থাপনা - ০৭

২.১.১. কৃষিতে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ - ০৭

২.১.২. সরকারী মজুদ হতে জরুরী বিতরণ - ০৭

২.১.৩. বেসরকারী বাণিজ্য এবং মজুদের মাধ্যমে যোগান বৃদ্ধির পদক্ষেপ - ০৮

কৌশল-২.২ খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে লক্ষ্যমুখী খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির ফলপ্রদ বাস্তবায়ন - ০৮

কৌশল-২.৩ কর্মসংস্থানমূলক আয় বৃদ্ধি - ০৮

২.৩.১. আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে মহিলাদেরকে সহায়তা প্রদান - ০৮

২.৩.২. কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমূলক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ - ০৯

২.৩.৩. কৃষিভিত্তিক শিল্প উন্নয়নে উৎসাহদায়ক সুবিধা - ০৯

২.৩.৪. গ্রামীণ শিল্পের প্রসারে বিশেষ সহায়তা - ০৯

২.৩.৫. শিক্ষা, দক্ষতা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন - ০৯

২.৩.৬. শ্রমনিবিড় প্রবৃদ্ধির প্রসারে সামষ্টিক নীতি - ০৯

উদ্দেশ্য-৩.০ সকলের (বিশেষতঃ নারী ও শিশুর) জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি - ১০

কৌশল-৩.১. স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি গঠনে সুষম খাদ্যের সংস্থানকল্পে সুদূরপ্রসারী জাতীয় পরিকল্পনা - ১০

৩.১.১. সমৃদ্ধ জাতি গঠনে শারীরিক সামর্থের প্রয়োজনে সুদূরপ্রসারী লক্ষমাত্রা নির্ধারণ - ১০

৩.১.২. দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য গ্রহণের মাত্রা নির্ধারণ - ১০

৩.১.৩. প্রয়োজনীয় পুষ্টিচাহিদা পরিপূরণে সুষম খাদ্য সংস্থানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ - ১০

৩.১.৪. স্বল্পতম ব্যয়ে সুষম খাদ্য সংস্থানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ - ১০

কৌশল-৩.২. দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ - ১০

কৌশল-৩.৩. পর্যাপ্ত মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সম্পন্ন সুষম খাদ্য সরবরাহ -১০

৩.৩.১. পুষ্টি শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি - ১১

৩.৩.২. খাবার বহুমুখীকরণ (diet diversification) - ১১

৩.৩.৩. ফলপ্রসূ খাদ্য পরিপূরণ এবং সুরক্ষাকরণ - ১১

কৌশল-৩.৪. নিরাপদ খাবার পানি এবং উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন - ১১

কৌশল-৩.৫ নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য সরবরাহ - ১১

কৌশল-৩.৬. পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যমান - ১১

ঙ. খাদ্যনীতি গবেষণা, বিশেষণ এবং সমন্বয় - ১২

চ. উপসংহার - ১২

জাতীয় খাদ্যনীতি, ২০০৬

ক. পটভূমি

খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে খাদ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ- যেখানে দেশের জনগণ তাদের আয়ের বেশীরভাগ খাদ্যের জন্য ব্যয় করে। রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হল সকল সময়ে সবার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। সরকারের কার্যবিধি অনুযায়ী জাতির জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সংজ্ঞা অনুযায়ী সকল সময়ে সকল নাগরিকের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবন যাপনে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা নিশ্চিতকল্পে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকারের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় এর প্রতিফলনও ঘটেছে।

বাংলাদেশ ১৯৯৪ সালের উরুগুয়ে বাণিজ্য চুক্তি (GATT Uruguary Round Agreement) -এর একটি স্বাক্ষরকারী দেশ - যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি বাণিজ্য উদারীকরণ নীতিও গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সভার পরামর্শমতে ২০০০ সালে "বাংলাদেশের জন্য একটি সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নীতি" শিরোনামে টাস্কফোর্স প্রতিবেদন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমকে বর্ধিত আঙ্গিকে সুসংহত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকারের প্রচেষ্টাকে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করতঃ ইতোমধ্যে আরও সঙ্গতিপূর্ণ ও সুসংহত করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতি ও কৌশলসমূহ পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ১৯৮৮ সালে গৃহীত দেশের প্রথম খাদ্যনীতির লক্ষ্য ছিল খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বিধান। কেবলমাত্র খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে প্রণীত খাদ্যনীতি, ১৯৮৮-তে খাদ্যশস্যের লভ্যতা ব্যতিরেকে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ে অপূর্ণতা থেকে যায়। সম্প্রতি গৃহীত দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের আলোকে এবং বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা অনুযায়ী বর্ধিত আঙ্গিকে বর্তমান খাদ্যনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিগত দশকে বাংলাদেশে খাদ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে - যেখানে চাল ও গমের বাজারে অধিকমাত্রায় সরকারী হস্তক্ষেপ কমিয়ে বাজারমুখী করা হয়েছে; একই সাথে সরকারী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাকে সুসংহত করে দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারসমূহের জন্য অধিকতর লক্ষ্যমুখী করা হয়েছে। অধিকন্তু, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যশস্যের লভ্যতা সন্তোষজনকভাবে বজায় থাকায় এবং পুষ্টিশিক্ষাসহ শিশু ও নারীর পুষ্টি উন্নয়নমুখী প্রচেষ্টাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে সরকারের খাদ্যনীতির ব্যাপ্তি ক্রমশ প্রসার লাভ করেছে। বাংলাদেশের জীবনধারণোপযোগী গ্রামীণ অর্থনীতিতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি মৌলিক খাদ্যের উৎপাদন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাষযোগ্য জমি হ্রাসের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। দেশে বিদ্যমান দারিদ্রাবস্থায় উপরিউক্ত নিয়ামকসমূহ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা বিধানকে জটিল করে তুলেছে।

সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও খাদ্য লভ্যতার ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য সফলতা অর্জন সত্ত্বেও ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বিধান সরকারের জন্য একটি গুরুত্ববহ বিষয় হয়ে থাকছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে তাৎপর্যপূর্ণ সফলতা অর্জন করেছে - যা বহুলাংশে জাতীয় পর্যায়ে অপ্রতুল খাদ্য লভ্যতার সমস্যা দুরীকরণে সহায়ক হয়েছে। পর্যাপ্ত খাদ্যের লভ্যতা নিশ্চিতকরণের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য হলেও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যথেষ্ট নয়। সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারসমূহের জন্য খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা ও সংগৃহীত খাদ্যের যথাযথ ব্যবহারে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (২০০০) অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার সকল দিক, যথা- (১) অভ্যন্তরীণ কৃষি ব্যবস্থার অধিকতর দক্ষতা আনয়নসহ খাদ্যের বর্ধিত লভ্যতা, (২) খাদ্য নিরাপত্তাহীন জনগোষ্ঠীর জন্য বর্ধিত খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা, (৩) খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দরিদ্র ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর টেকসইভাবে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা, (৪) সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ এবং (৫) ভোগকৃত খাদ্যের যথাযথ ব্যবহার ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টিহীনতা নিরসনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় নিজস্ব দায়িত্বাধীন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সহায়ক সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিমুলক নীতি ও কর্মসুচি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাতে সকল প্রকারের সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবে। এভাবে সরকারের সকল সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিজস্ব খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিমুলক (অনুমোদিত খাদ্যনীতির আলোকে পরবর্তীকালে সহযোগী মন্ত্রণালয়সমুহের সহায়তায় সমন্বিতভাবে প্রণীতব্য খাদ্য নিরাপত্তা কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত) কর্মসুচিসমূহ সম্মিলিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব হবে।

খ. খাদ্যনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সকল সময়ে সকল জনগণের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত খাদ্যনীতির উদ্দেশ্যসমূহ হবে-

উদ্দেশ্য- ১: নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা ;
উদ্দেশ্য- ২: জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা/সুযোগ বৃদ্ধি করা ; এবং
উদ্দেশ্য- ৩: সকলের (বিশেষত: নারী ও শিশুর) জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি বিধান করা ।

গ. সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার ধারণাগত কাঠামো

খাদ্যনীতির ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে সকল সময়ে সকল জনগণের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশে বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রভুত উন্নয়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খাদ্যনীতি একটি বহুমাত্রিক বিষয় - যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট স্ব স্ব কর্মসূচি ও কৌশলসমুহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ লক্ষ্য হিসেবে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নকল্পে একটি ফলপ্রসু খাদ্যনীতি প্রণয়ন বাংলাদেশের জন্য অতীব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। জাতির কল্যাণে নিয়োজিত সবার জন্য এটি একটি গভীর তাৎপর্যবহ বিষয়। খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞানুযায়ী তখনই খাদ্য নিরাপত্তা বিরাজমান - যখন সকলের জন্য একটি কর্মক্ষম, স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনমুখী জীবনযাপনের জন্য সকল সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম একটি উপাদান হল জাতীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের লভ্যতা (food availability), যা প্রায়শই জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অপর অপরিহার্য উপাদান হল ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food)। খাদ্য নিরাপত্তার তৃতীয় অপরিহার্য উপাদান হল খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার (utilisation of food), যা অন্যান্য নিয়ামকসমূহ যথা - সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের উপস্থিতি এবং পরিবার বা সরকার কর্তৃক সমাজের দুস্থ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের বিষয়টি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল যেখানে যুগপৎভাবে প্রত্যেকটি নিয়ামকই যথেষ্ট গুরুত্ব পাওয়া আবশ্যক। এসকল নিয়ামকের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক নির্ভরতা বিদ্যমান থাকায় খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত সকল বিষয়ের মধ্যে সুক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যের লভ্যতা (food availability at national level) অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, সরকারী ও বেসরকারী মজুদ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বাণিজ্য উদারীকরণের সাথে সাথে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যের সরবরাহ মুল্য পরিস্থিতির গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। পরিবারের নিজস্ব উৎপাদন/সংগ্রহের ক্ষমতা, পরিবারের খাদ্য মজুদের পরিমাণ এবং স্থানীয় বাজারে খাদ্যের লভ্যতার উপর পরিবার পর্যায়ে খাদ্যের লভ্যতা (food availability at household level) নির্ভর করে। তবে উপরোলিখিত বিষয়াদি বাজার কার্যক্রম অবকাঠামো, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মৌসুমী ভিন্নতা, বাজার দক্ষতা ও সরকারী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

পারিবারিক খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food) আয়, সম্পদ, বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ প্রাপ্তি, উপহার, ঋণ, আয়-হ্রাস এবং খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে। পারিবারিক আয় ও খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা সম্ভব। অধিকন্তু, বর্ধিত সম্পদভিত্তি পারিবারিক আয়ের সাময়িক ব্যাঘাতের ঝুঁকি হ্রাসসহ প্রতিকূল সময়ে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা হ্রাসের মাত্রা ঠেকানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাজারে খাদ্যমুল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকৃত আয় (real income) কমে গিয়ে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় নিম্ন-আয়ের পরিবারসমুহ সাময়িক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় (transitory food insecurity) পতিত হয়।

খাদ্যের লভ্যতা এবং খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা/সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণ করা সম্ভব হলেও তাতে অপুষ্টি (malnutrition) নিরসন সম্ভব নাও হতে পারে। দীর্ঘকালীন অপুষ্টির কারণ মুলত খাদ্য ভোগ ও অসুস্থতার মিথক্রিয়ার মধ্যে নিহিত থাকে যা জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যাঘাত ঘটায় এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। পুষ্টি অবস্থা উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তির ক্ষমতা নিশ্চিতকরণ অপরিহার্য। খাদ্য-বহির্ভূত অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের (যেমন - উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পয়ঃনিস্কাশন, নিরাপদ পানি) অপ্রতুলতা ও অকার্যকর সরবরাহ ব্যবস্থা এবং তার দক্ষ পরিচালনার অভাবে দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাসমুহের কার্যকারিতাকে অর্থহীন করে তুলতে পারে। অসহায় জনগোষ্ঠীর পুষ্টিবস্থা উন্নয়নের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশসম্মত সুবিধাদি স্থানীয় পর্যায়ে সহজলভ্য করে তা পরিবারের শিশু, নারী ও দুস্থ সদস্যদের নিকট পৌছানোর সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। অন্তঃপরিবার (intra-household) পর্যায়ে যথাযথ পরিচর্যায় অভ্যাস গড়নসহ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে লিঙ্গভেদ বা অন্য কোন পক্ষপাতিত্ব না করে জৈবিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে খাদ্যভোগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

ঘ. জাতীয় খাদ্যনীতির উদ্দেশ্য, পদ্ধতি-কৌশল ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য -১. নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম আঙ্গিক হল অব্যাহতভাবে সকল জনগোষ্ঠীর আয়ের সাথে সংগতিপুর্ণভাবে খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্যের লভ্যতা নিশ্চিত করা। একটি কর্মঠ ও সুস্থ জীবন অর্জনের জন্য যে পরিমাণ গুণসম্পন্ন খাদ্যের প্রয়োজন সেই পরিমাণ খাদ্য সকলে সবসময় ক্রয় করতে পারলে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে স্থিতিশীল মুল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহসহ শস্য বহির্ভূত পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও প্রকৃত আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বিক কৃষি উন্নয়ন অপরিহার্য। উচ্চফলনশীল শস্যজাত ব্যবহারের পাশাপাশি বাংলাদেশের উর্বর জমি, পর্যাপ্ত শ্রমিক ও পানি সম্পদের প্রতুলতা ইত্যাদি সুবিধার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগবিহীন বছরসমুহে দেশে যথেষ্ট পরিমাণ ধান উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছে। এসকল কারণেই অভ্যন্তরীণ খাদ্য অর্থনীতিতে শস্য হিসেবে চালের আধিপত্য বজায় থাকছে। খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়া বাংলাদেশ সরকারের একটি লক্ষ্য এবং সরকার অভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

কৌশল ১.১. দক্ষ ও টেকসইভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি

দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে প্রচেষ্টাসমুহের মুল দিক হচ্ছে দক্ষ ও টেকসইভাবে অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি। টেকসইভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সার্বিক পুষ্টি চাহিদার নিরিখে কৃষিকে বহুমুখীকরণ প্রয়োজন। কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, বিদ্যমান ভুমির সর্বোত্তম ও দক্ষ ব্যবহার, কৃষি উপকরণসহ সেচের জন্য পানির দক্ষ ব্যবহার, পশুসম্পদ, মৎস্য ও ফলসহ অশস্যজাত খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষি নিবিড়করণে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, গবেষণা ও কৃষিঋণ সরবরাহের লক্ষ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ সরকার নিম্নোক্ত পদ্ধতি ও কার্যাবলী গ্রহণ করবে ঃ

১.১.১. কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

টেকসইভাবে দীর্ঘমেয়াদে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন ও শস্য-বহুমুখীকরণ, খাদ্যাভাস পরিবর্তনসহ উন্নত বীজ সরবরাহ এবং মাটির গুণগতমান সংরক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকার গবেষণা ও সম্প্রসারণমুলক নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমুহ গ্রহণ করবে ঃ

১) লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রায়োগিক কৃষি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে পর্যাপ্ত অর্থায়ন;
২) অঞ্চলভিত্তিক ভুমির উৎপাদনশীলতা, শস্যের উপযুক্ততা এবং আনুষঙ্গিক কৃষি পরিবেশ বৈশিষ্ট্যাবলী বিবেচনান্তে একটি দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৩) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে রাস্তাঘাট, খাল ও সেচ ব্যবস্থা, পল্লী বিদ্যুতায়ন এবং বাজার অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ; এবং
৪) কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং লাগসই উৎপাদন প্রযুক্তির প্রসারের জন্য মানব সম্পদের ফলপ্রসু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

১.১.২ পানি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার

খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন এবং ফলন বৃদ্ধির জন্য সেচ অন্যতম প্রধান উপাদান। দীর্ঘমেয়াদে ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা ও ফলনের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির জন্য একটি সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ঃ

(১) সেচযুক্ত এলাকাসমুহের মধ্যে ফলন ব্যবধান (yield gap) হ্রাস ও টেকসইভাবে দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে ফসল চাষের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষকদেরকে সম্পুরক সেচ ব্যবহারের জন্য উৎসাহিতকরণ;
২) সরকারী ও বেসরকারী খাতে সেচের জন্য ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং সেচ অবকাঠামো উন্নয়নে উৎসাহিতকরণ;
৩) চাষাবাদের জন্য নিরাপদ, দুষণমুক্ত সেচের পানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
৪) এলাকাভিত্তিক অংশগ্রহণমুলক সেচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়ন;
৫) ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে একটি পানি সংরক্ষণ নীতি-কৌশল উদ্ভাবনকরতঃ সংরক্ষিত পানি সম্পুরক সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;
৬) মৎস্য সম্পদের ক্ষতি না করে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির সহনীয় পর্যায়ে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
৭) কৃষি উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত সেচযন্ত্র সমুহে সেচকালে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
৮) পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য বর্ধিতহারে সেচপ্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রয়োগে উৎসাহিতকরণ; এবং
৯) লাগসই সেচপ্রযুক্তির প্রসার এবং বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় খরা মোকাবেলার জন্য পরিপুরক পদক্ষেপ গ্রহণ।

১.১.৩. কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা এবং তার দক্ষ ব্যবহার

গ্রহণযোগ্য মুল্যে সময়মত উন্নতমানের কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা ও তার দক্ষ ব্যবহারের উপর খাদ্য উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভরশীল। কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা এবং তার দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সরকার নিম্নোক্ত কার্যবলী গ্রহণ করবে ঃ

১) শস্য ও মৎস্য চাষে প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহ ঘাটতি ও উচ্চহারে মুল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে সারসহ অন্যান্য উপকরণের পর্যাপ্ত পরিমাণে সময়মত ও সুষম বন্টন নিশ্চিতকরণ ;
২) সারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সামঞ্জস্যপুর্ণ মুল্যনীতি প্রণয়ন;
৩) বীজ খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;
৪) বিশেষ ক্ষেত্রে বীজ আমদানি উদারীকরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ ;
৫) বীজ, কৃষি-রাসায়নিক দ্রব্য ও সারের মান-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিধি প্রণয়ন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ;
৬) কৃষক, মৎস্যচাষী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য সার ও কৃষি রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যে trace element -এর পরিমাণ সীমিতকরণ ;
৭) শস্যক্ষেতে ব্যবহৃত কীটনাশক ব্যবহার সীমিতকরণের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ ;

৮) ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা কর্মসুচির প্রসার সাধন ; এবং
৯) প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বালাই নিয়ন্ত্রণভিত্তিক "সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কর্মসুচি (IPM)" জোরদারকরণ এবং বর্ধিতহারে জৈবসার ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশসম্মত, টেকসই কৃষিব্যবস্থা ও সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রচলন নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ।

১.১.৪ কৃষি বহুমুখীকরণ, উন্নত প্রযুক্তি ও গবেষণা

খাদ্য লভ্যতার প্রাথমিক উপাদান হিসেবে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরা ছাড়াও অশস্য ফসল ও ফসল বহির্ভূত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে কৃষিকে বহুমুখীকরণ, উন্নত কৃষি-প্রযুক্তি গবেষণা/সম্প্রসারণ এবং উত্তোলনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি সীমিতকরণ গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে সরকারের নীতি হবে ঃ

১) অশস্য ফসল (বিশেষতঃ ডাল, তৈলবীজ, মসলা ও শাকসব্জি)-এর ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার উলেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা;
২) মৌসুম, জাত এবং উত্তোলন প্রযুক্তি ব্যবহারের পর্যায়ভেদে ফলমূল, শাক-সব্জি ও মসলার উৎপাদন ভিন্নতার কারণে বাজারে সরবরাহ বেড়ে গেলে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতি ও অপচয় রোধে লাগসই ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩) খরাপ্রবণ এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিকল্পে বৃষ্টিনির্ভর চাষাবাদে ব্যবহারের জন্য বন্যা ও খরা সহনশীল জাত চিহ্নিতকরণ এবং লবণাক্ততা সীমিতকরণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও প্রসার সাধন;
৪) অতি সম্প্রতি উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রবর্তিত Genetically Modified (GM) শস্যজাতের মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যের স্বাস্থ্যগত প্রভাব পরিধারণ ; এবং
৫) সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার মাধ্যমে এযাবৎ উদ্ভাবিত ফসল ও পশু-পাখীর ক্ষেত্রে উন্নতজাত উদ্ভাবনে জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ে আরও গুরুত্ব প্রদানসহ বেসরকারী সংস্থাসমূহকে বর্ধিতহারে সম্পৃক্তকরণ।

১.১.৪.১ খাদ্যশস্য বহির্ভূত (শাকসব্জি, তৈলবীজ, ডাল ও ফলমূল) ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি

খাদ্যশস্য বর্হিভূত ফসলের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির শথগতির প্রেক্ষাপটে খাদ্যশস্য বহির্ভূত ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা দ্রুত বৃদ্ধিকল্পে এবং মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে -

১) খাদ্যশস্য বহির্ভূত ফসলের ক্ষেত্রে কৃষিতাত্ত্বিক গবেষণা এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে অধিকতর অগ্রাধিকার প্রদান;
২) সুদৃঢ় সম্প্রসারণ ও উপকরণ সেবা-সহায়তাপূর্ণ যথাযথ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে আধুনিক জাতের ফসল প্রবর্তন;
৩) খাদ্যশস্য-বহির্ভূত ফসলের উৎপাদন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সুসংগঠিত বিপণন সুবিধাসহ প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও গুদামজাতকরণ ইত্যাদির উন্নয়ন ;
৪) মৌসুমী ফলমূল, শাকসব্জি, মৎস্য ও পশুজাত পণ্যসহ অন্যান্য ফসলের উত্তোলনোত্তর পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তি প্রসারের জন্য বিনিয়োগ সহায়তা ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ; এবং
৫) জীবপ্রযুক্তি গবেষণায় সহায়তা প্রদানসহ স্বাস্থ্যের উপর GM খাদ্যের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পরিধারণ।

১.১.৪.২. শস্য বহির্ভূত (পশুসম্পদ ও মৎস্য সম্পদ) কৃষি উন্নয়ন

সুষম খাদ্যভোগের জন্য প্রয়োজনীয় দুধ, মাংস ও ডিমের উৎস হচ্ছে পশুসম্পদ। দেশের সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য পশুসম্পদ ও মৎস্য খাতে বর্ধিত হারে উৎপাদনকে এক্ষেত্রে অন্যতম নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুসম্পদ ও মৎস্য এ দুটি খাতের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনান্তে সরকার নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সাধনে উৎসাহ প্রদান করবে ঃ

১) গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে মৎস্য ও পশুসম্পদের গুণগতমান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
২) ব্যাপকহারে টিকা প্রদানের মাধ্যমে সংক্রামক রোগসহ পরজীবিক্ষত নিয়ন্ত্রণ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন এবং আদি প্রজাতিসমুহের সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ;
৩) মৎস্য ও পশুসম্পদের জন্য মৎস্য ও পশু খাদ্য (fish, poultry and livestock feed) উৎপাদন শিল্প উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
৪) মৎস্য ও পশুজাত পণ্যের উৎপাদন প্রযুক্তি ও উপকরণ সরবরাহ, পণ্য সংরক্ষণ ও বিপণনে উন্নত প্রযুক্তির প্রসারের জন্য বিনিয়োগ সহায়তা, বিপণন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ;
৫) স্বল্প-সম্পদশালী ও দরিদ্রদের ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাসমুহকে বর্ধিতহারে সম্পৃক্তকরণপুর্বক প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রসারে সহায়তা প্রদান;
৬) ধান ক্ষেতে সমষ্টিগতভাবে মাছ ও ধান যৌথ উৎপাদনের প্রসার নিশ্চিতকরণ ;
৭) পরিবেশবান্ধব ও বিজ্ঞানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে উৎস পর্যায়ে উন্নতমান নিশ্চিতকরণসহ বর্ধিত উৎপাদন উৎসাহিতকরণ; এবং
৮) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই আহরণের কৌশল উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।

১.১.৫ কৃষিঋণ

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সম্পদ-নিবিড় আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে কৃষিকে নিবিড় ও বহুমুখীকরণে কৃষিঋণের ভূমিকা অপরিহার্য। কৃষকদের জন্য কৃষিঋণের লভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ঃ

১) যথাসময়ে কৃষিঋণের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে ঋণ সরবরাহের যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি প্রবর্তন ; এবং
২) ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকসহ সকল কৃষকের জন্য ঋণপ্রাপ্তির ক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র কৃষকদেরকে কৃষি উৎপাদন সংশিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচির অন্তর্ভুক্তিকরণ।

কৌশল -১.২. দক্ষ খাদ্যবাজার

খাদ্য বাজারের সন্তোষজনক অবস্থানের ক্ষেত্রে চাহিদা, উৎপাদনের ধারা, প্রযুক্তি এবং বিশ্ববাণিজ্যের পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে অভ্যন্তরীণ খাদ্য বাজার কাঠামোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা প্রয়োজন। বিরাজমান বাজার কাঠামোর দক্ষতা নিরূপণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মুল্যে বাজারজাতকরণ দায়িত্ব সম্পাদনসহ বাজার পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে চাহিদা ও যোগানের সংবেদনশীলতার বিষয়সমুহ বিবেচ্য। খাদ্যবাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীগণের আগমন, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, খাদ্যদ্রব্য পরিবহনে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা, ত্রুটিপুর্ণ পণ্যবিন্যাস (grading) ইত্যাদি বিষয় প্রতিযোগিতামুলক বাজার পরিবেশ সৃষ্টিকে ব্যাহত করেছে। বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন, বেসরকারী বাণিজ্যে অবাধ চলাচল ও গুদামজাতকরণ, বিপণন কার্যাবলীর জন্য প্রয়োজনবোধে বেসরকারী খাতকে উৎসাহদায়ক সুবিধাদি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বাজার পরিবেশের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নে পক্ষপাতমুক্ত ঋণ, বিপণন সহায়ক আইন ও বাণিজ্য অনুকূল নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ এবং মূল্য স্থিতিশীলকরণের জন্য খাদ্যশস্য বাজারে অনুকূল সরকারী হস্তক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত।

১.২.১ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন

যথোপযুক্ত মানসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য বাজার অবকাঠামোই হচ্ছে সামগ্রিক অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের টেকসই প্রবৃদ্ধির মৌলিক নিয়ামক। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় বেসরকারী খাতের অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পরিবহণ সুবিধা, গুদামজাতকরণ, অবকাঠামো ইত্যাদিতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান প্রয়োজন। বাজার সুবিধাদি যেমন - বিক্রির জন্য যথোপযুক্ত স্থান, নিলাম কক্ষ, ওজনযন্ত্র ইত্যাদি খাদ্য বাজারের দক্ষতা উন্নয়নে নিমিত্তস্বরূপ।

দক্ষ খাদ্য বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য সরকার নিম্নের কার্যাবলী সম্পাদন করবে -

১) ফসল উত্তোলন পরবর্তী পর্যায়ে পরিচর্যা, পণ্যবিন্যাস, একত্রীকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাদি উন্নয়ন ও অপচয় হ্রাসের মাধ্যমে খামারজাত পণ্যাদি বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে লাগসই প্রযুক্তি সহযোগে অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্প্রসারণ ;

২) খামারজাত পণ্য বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাদি উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা গঠনে উৎসাহ প্রদান ও উন্নয়ন ;

৩) যথোপযুক্ত স্থানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের জন্য স্থাপনা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদেরকে বর্ধিতহারে মুলধন ও ঋণ, সহায়তা প্রদান ;

৪) যথাযোগ্য স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাজার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান ; এবং

৫) খামার ও বাজারের সংযুক্তি সড়কের উন্নয়ন এবং অন্যান্য সেবামুলক সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

১.২.২. বেসরকারী খাদ্য ব্যবসা উৎসাহিতকরণ

দেশে বেসরকারী খাতে খাদ্য ব্যবসায় লক্ষাধিক খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ী এবং মিল মালিকগণ ক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বিপণনে নিয়োজিত। অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানী বাজারের চাহিদামাফিক কাঙ্খিত সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য আধুনিক ছাঁটাই, পরিচ্ছন্নকরণ, বাছাই ও মোড়কজাতকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন প্রয়োজন।

বেসরকারী খাতে খাদ্য ব্যবসা উৎসাহিতকরণে সরকার নিম্নের কার্যাবলী সম্পাদন করবে ঃ

১) বেসরকারী খাদ্য বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাছাই ও মজুদ সংরক্ষণে যথোপযুক্ত উৎসাহদায়ক ব্যবস্থা বজায় থাকবে ;

২) প্রয়োজনের সময় শুল্কহার সমন্বয় ও অন্যান্য প্রশাসনিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আমদানি উৎসাহিতকরণ এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে বিরূপ প্রভাবকারী অতিরিক্ত আমদানি পরিহারের মাধ্যমে ক্ষতিকর প্রভাব সীমিতকরণ,এবং

৩) উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও সরবরাহকালীন সময়ে কৃষি পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি উৎসাহিতকরণ।

১.২.২.১ খাদ্যদ্রব্যের বেসরকারী গুদাম এবং চলাচল ব্যবস্থা উন্নয়ন

বেসরকারী খাতে বিদ্যমান গুদামজাতকরণ সুবিধাদি খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণের উপযোগী নয়। এজন্য মানসম্মত বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণাগার নির্মিত হওয়া প্রয়োজন। নির্ধারিত দ্রব্যভিত্তিক গুদাম ও হিমাগার নির্মাণ এবং পরিবহনের জন্য যানবাহন সংগ্রহ ইত্যাদিতে বেসরকারী খাতে ঋণ সুবিধাদি প্রদানে ব্যাংক আইন সহজীকরণ ও সংশোধনের মাধ্যমে সরকারের নীতি উৎসাহদায়ক হবে।

বেসরকারী পর্যায়ে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণ ও চলাচল উন্নয়নে সরকার ঃ

১) দেশে খাদ্যদ্রব্যের অবাধ চলাচল উদারীকরণ ও

২) উপযুক্ত স্থানে গুদাম কাঠামো উন্নয়নে ঋণ সুবিধাদি নিশ্চিত করবে।

১.২.২.২ খাদ্য ব্যবসায় উদার ঋণ (Liberal Credit) পদ্ধতি জোরদারকরণ

উন্নত বাজার কাঠামো প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ পুর্বশর্ত হচ্ছে খাদ্য ব্যবসায় নবাগতদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও তাদের ঋণ প্রাপ্তিতে বাধা-নিষেধ হ্রাস। খাদ্য বিপণনে উদার ঋণ বিতরণ পদ্ধতি জোরদারকরণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনজনিত বাজারজাতকরণের সংশ্লিষ্ট অনেক সমস্যাই দূরীকরণ সম্ভব।

খাদ্য ব্যবসায় ঋণের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার -

১) পরামর্শ এবং পরিবীক্ষণ সেবার মাধ্যমে উদার ঋণ বিতরণ পদ্ধতি জোরদার ও

২) পল্লী এবং দুর্গম এলাকায় ব্যাংকিং সুবিধাদি সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করবে।

১.২.৩ বাণিজ্যসহায়ক আইন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ উন্নয়ন

বাজারকে বাণিজ্যসহায়ক বিধি-বিধানের আওতায় আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বিপণন আইনের ধারাসমূহ এবং কারবার প্রথা পুনর্বিন্যাসসহ বিপণন চার্জ, কর এবং শুল্ক যুক্তিসংগত করা ও বাজার উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। খামারজাত পণ্যের বিপণনে সেবাসমূহের দক্ষ সরবরাহ ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিপণনে নিয়োজিত বিভিন্ন বিপণন-প্রতিনিধি, পাইকার, অনানুষ্ঠানিক

বিনিয়োগকারী ও আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী মধ্যস্বত্বকারীদের অনুকূল ভূমিকাকে স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন। বাজার কাঠামো উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণমূলক ও আইনগত সহায়তা বাজারের প্রত্যেক পর্যায়ে নতুনদের প্রবেশ উৎসাহিত করার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

বাণিজ্যসহায়ক আইন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ঃ

১) খাদ্যপণ্যের বেসরকারী মজুদ ও সরবরাহ ব্যবস্থার একটি নির্ভরযোগ্য পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ ;
২) বাজারে নিয়োজিত মধ্যস্থতাকারীদের অনুকূল ভূমিকাকে স্বীকৃতি নিশ্চিতকরণ ; এবং
৩) প্রতিযোগিতামূলক বিপণন প্রসারে এন্টি-ট্রাষ্ট ও একচেটিয়া বাজার প্রতিষ্ঠা নিরোধক বিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ।

১.২.৪ পূর্ব-সতর্কীকরণ ও বাজার তথ্য পদ্ধতি উন্নয়ন এবং প্রচার

জাতীয় খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে একটি দক্ষ কার্যকর পূর্ব-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গুর"ত্বপূর্ণ নিয়ামক। একটি দক্ষ ও কার্যকর পূর্ব-সতর্কীকরণ পদ্ধতি বিশ্ব পূর্ব-সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সাথে সমন্বিতভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার নিংেক্ত কার্যাবলী স"ম্পন্ন করবে ঃ

১) জাতীয় ও বিশ্বপর্যায়ের উভয় ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রা" নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন ;
২) অভ্য"রীণ ও আর্"জাতিক বাজারসমূহে বিরাজমান সরবরাহ, চাহিদা ও মূল্য পরিস্থিতি এবং জলবায়ু, খাদ্য উৎপাদন ও বিদ্যমান সরবরাহ স"ম্পর্কে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন পূর্বাভাস প্রদান ; এবং
৩) উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য খাদ্য তথ্য ও পূর্ব-সতর্কীকরণ বিষয়ে বিশেষণমূলক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা পরিচালনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে উন্নত পূর্বাভাস পদ্ধতির প্রবর্তন।

কৌশল -১.৩. মূল্য স্থিতিশীলকরণে খাদ্যশস্য বাজারে অবিকৃত সরকারী হ"স্তক্ষেপ

খাদ্য শস্য বাজারে সরকারী হ"স্তক্ষেপ এবং খাদ্য শস্যের মজুত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার উৎপাদনকারী ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থরক্ষায় ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে কৃষি প্রবৃদ্ধি বা দরিদ্র জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত না হয়। বিশেষতঃ বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের (উৎপাদক ও ভোক্তা) কল্যাণে খাদ্যশস্যের মূল্য একটি গুর"ত্বপূর্ণ নিয়ামক। খাদ্য শস্যের উৎপাদন ব্যয়ের উর্দ্ধগতি কৃষকদের আয়ের অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি করা ছাড়াও কৃষিকাজে অত্যাবশ্যকীয় সেচ, কৃষি-যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী খাতে বেসরকারী বিনিয়োগে নির"ৎসাহিত করে। যেহেতু দরিদ্র পরিবারের খাদ্যের জন্য ব্যয় বর্তমানে পরিবারের মোট আয়ের শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী, তাই ভোক্তাপর্যায়ে খাদ্যের মূল্য উলেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলে দরিদ্র পরিবারের প্রকৃত আয় হ্রাস পায়। ফলে তাদের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পায়- যা তাদের জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে। বাজারের মূল্য স্থিতিশীলতাকে ত্বরান্বিতকরণ, প্রতিযোগিতা উৎসাহিতকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে এবং বেসরকারী বাণিজ্য ও গুদামজাতকরণকে নির"ৎসাহিত না করে সরকার খাদ্যশস্য বাজারে অবিকৃত হ"স্তক্ষেপ কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিশেষতঃ আর্"জাতিক বাজারে দ্র"ত পরিবর্তন, অভ্য"রীণ উৎপাদনে হ্রাসবৃদ্ধি এবং উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুযোর্গের কারণে খাদ্যের মূল্য অব্যাহতভাবে স্থিতিশীল রাখা সহজ নয়। খাদ্যশস্যের মূল্যের ব্যাপক উঠানামার কারণে একটি অবিকৃত মূল্য স্থিতিশীলকরণ নীতি একা" আবশ্যক।

১.৩.১ অভ্য"রীণ খাদ্য উৎপাদনে মূল্য সহায়তা

অভ্য"রীণ উৎপাদন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত উৎপাদন সহায়তা প্রদানে প্রধান সংগ্রহ অঞ্চলে (intensive procurement zone) খাদ্যশস্যের গড় উৎপাদন ব্যয়ের উর্দ্ধে খাদ্যশস্য সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণপূর্বক সরকারী সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সরকারী সংগ্রহমূল্য (fixed procurement price)-এর সাথে গুদামখরচ, পরিবহন ও বিতরণ ব্যয় জড়িত থাকায় বিতরণ (public food distribution)-এর ক্ষেত্রে সরকারকে উলেখযোগ্য পরিমাণ ভর্তুকী প্রদান করতে হয়।

অভ্য"রীণ খাদ্য উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্য সরকারের নীতি হবে ঃ

১) অভ্য"রীণ খাদ্য বাজার হতে খাদ্যশস্য ক্রয়ে ;
   ক) কৃষকদের পর্যাপ্ত মুনাফা এবং উৎপাদন ব্যয় পরিপূরণের জন্য যথাযথ মূল্যে (তবে মূল্য এত বেশী না হয় যা অন্যান্য নীতি বিরোধী কাজ করাকে উৎসাহিত করে) অভ্য"রীণ সরকারী সংগ্রহ কর্মসূচি গ্রহণ ;
   খ) উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে অভ্য"রীণ বাজার থেকে ক্রয়।
২) উৎপাদকের লাভজনক মূল্য নিশ্চিতকরণে বিপণন পদ্ধতি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান ; এবং
৩) বেসরকারী খাতে গুদামজাতকরণ ও বাজার অবকাঠামো উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা।

১.৩.২ সরকারী খাদ্যশস্য মজুদ

অভ্য"রীণ উৎপাদন কমবেশী হবার ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধিকালে যুগপৎভাবে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীর কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরকার সরাসরি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বাজারে হ"স্তক্ষেপ করে। সরকারী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হল স্বাভাবিক বাজার মূল্যে খাদ্য ক্রয়ে অসমর্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য-সহায়ক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং আয় সঞ্চালনমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা। খাদ্যভিত্তিক বিভিন্ন সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের মজুদ সংরক্ষণ করা ছাড়াও সরকার দুর্যোগকালীন জর"রী প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য নিরাপত্তা মজুদ সংরক্ষণ করে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকা ছাড়াও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আশানুরূপ উন্নতি প্রতিফলিত হয়েছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি (১৯৯৭)-তে সরকারী খাদ্য মজুদের পরিমাণ কমপক্ষে ৮ লাখ মেঃ টনে সংরক্ষণের নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। খাদ্যশস্য আমদানির অনিশ্চিত আগমন ও জর"রী প্রয়োজনে সরকার ১০ লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্য সরকারী মজুদ হিসাবে সংরক্ষণের সিদ্ধা" গ্রহণ করেছে। তবে অভ্য"রীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ মৌসুমে সরকারী মজুদের পরিমাণ সাধারণত এ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে এবং ফসল উত্তোলনপূর্ব সময়ে সরকারী মজুদের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার নীচে থাকে। সংগ্রহ ও বিতরণের পরিবর্তন (dynamics) বিবেচনায় এনে খাদ্য মজুদ গড়নে বা"স্ত অবস্থার প্রতিফলন থাকবে।

সরকারী খাদ্যশস্য মজুদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

১) খাদ্যশস্য মজুদের নিয়মিত পরিবীক্ষণ, খাদ্য মূল্য, খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বেসরকারী আমদানি, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, সরকারী সংগ্রহ ও বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ ;

২) সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে সামগ্রিক বাণিজ্যনীতির সাথে সমন্বিত করে বিশেষতঃ খাদ্য সরবরাহ ঘাটতিকালে প্রয়োজনীয় বাজার সরবরাহ বৃদ্ধিমূলক কৌশল অবলম্বন ;

৩) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বেসরকারী খাদ্য ব্যবসায় উৎসাহদায়ক ব্যবস্থা সংরক্ষণ বিবেচনায় নিয়ে সরকারী খাদ্য সংগ্রহের পরিমাণ নির্ধারণ ; এবং

৪) সংগ্রহ ও বিতরণের মৌসুমী পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে অর্থবছরের শুরুতে ১০ লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্যের সরকারী মজুদ সংরক্ষণ।

১.৩.৩ ভোক্তাদের মূল্য সহায়তা

লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিসমূহ দরিদ্র জনগণের পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক। সরকার দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারসমূহের পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচি যথা - দুস্থ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন (VGD), কাজের বিনিময়ে খাদ্য/অর্থ, দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা (VGF), শিক্ষার জন্য খাদ্য/অর্থ ইত্যাদি লক্ষ্যমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে। সীমিত সম্পদের কারণে এসকল কার্যক্রমের আওতাবহির্ভূত অথচ পুষ্টির দিক হতে ঝুঁকিপূর্ণ দরিদ্র পরিবারসমূহের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার একটি বিকল্প কৌশল হচ্ছে বাজার মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করা।

ভোক্তাদের মূল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঃ

১) অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির সময়ে খোলা বাজার বিক্রয় (OMS), স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ ;

২) বিশেষ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত গোষ্ঠীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় অগ্রাধিকার (EP), অন্যান্য অগ্রাধিকার (OP) এবং বৃহৎ কর্মসংস্থান শিল্প (LEI) ইত্যাদি বিতরণ খাতে নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয় ;

৩) উচ্চ মূল্যের কারণে পুষ্টি ঝুঁকিপ্রবণ দরিদ্র জনগণের মাঝে লক্ষ্যমুখী খাদ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্যশস্য সরবরাহ।

<u>উদ্দেশ্য -২. জনগণের ক্রয় ক্ষমতা এবং খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা</u>

পর্যাপ্ত খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে গৃহীত প্রচেষ্টায় সহায়তা প্রদান ছাড়াও সকল পরিবারের (বিশেষতঃ দরিদ্রদের) পারিবারিক খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকার দুটি মূখ্য পন্থা অবলম্বন করে। প্রথমতঃ তাৎক্ষণিক খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য স্বল্প মেয়াদে খাদ্য প্রাপ্তি ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কতিপয় কর্মসূচির মাধ্যমে সরাসরি খাদ্য হস্তান্তর বা খাদ্য-সাহায্য নগদায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বিতরণ। দ্বিতীয়তঃ কর্মসংস্থানমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদে দরিদ্র জনগণের খাদ্য প্রাপ্তি ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য সংগ্রহের সামর্থসহ ক্রয় ক্ষমতা টেকসইভাবে উন্নীতকরণের জন্য নীতিমালা বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার একটি প্রধান নিয়ামক হিসেবে খাদ্য প্রাপ্তির অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

কৌশল -২.১. তাৎক্ষণিক অভিঘাত ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে প্রায়ই বন্যা, সাইক্লোন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট আপদকালীন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দূরীকরণে জরুরী প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। ক্ষতিগ্রস্থদের তাৎক্ষনিক দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে জরুরী ত্রাণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। দুর্যোগ মোকাবেলায় আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য সতর্কীকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যম দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনা সম্ভব। দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের উলেখযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও ব্যাপক দারিদ্রের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্বল অবকাঠামোতে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দুযোর্গের বিরূপ প্রভাব সহণযোগ্য মাত্রা পর্যন্ত হ্রাস করা যায়নি। বর্তমানে জরুরী বিতরণের প্রয়োজনে সরকারকে তিনমাসের সমপরিমাণ খাদ্যশস্যের মজুত সংরক্ষণ এবং ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জরুরী খাদ্য বিতরণসহ নিরাপদ পানি, ঔষধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করতে হয়। এক্ষেত্রে দেশের জন্য একটি কার্যকর সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনা অপরিহার্য। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতাসহ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির কারণে বছরভিত্তিক খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সরকারী মজুদ মাত্রাও পর্যালোচনা (review) প্রয়োজন।

২.১.১ কৃষিতে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ

খরা, বন্যা ও সাইক্লোনের মত ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুযোর্গের কারণে বাংলাদেশের কৃষি অতিমাত্রায় ঝুঁকিপ্রবণ। ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুযোর্গ দরিদ্র জনগণের সীমিত সম্পদকে হ্রাস করে এমনকি কখনও কখনও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। নদী ভাংগন এবং কৃষি জমির গুণগত অবক্ষয়ের ফলে এ সমস্যা আরও প্রকট হয়। বন্যা ও খরাপ্রবণ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা অধিক হয়ে থাকে। এসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাতে বৈরী কৃষি পরিবেশযুক্ত নাজুক বাস্তুসংস্থানসম্পন্ন দরিদ্র কৃষকদের চাষাবাদে অপূরনীয় ক্ষতি হয়। ফলে তাদের তাৎক্ষণিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা আরও বেড়ে যায়। দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দূর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম খাদ্য নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কৃষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ অনুসরণ করবে ঃ

১) বিপুল ফলন হ্রাস ও ফসলহানি এড়ানোর জন্য খরার সময় সম্পূরক সেচ প্রদান ;

২) জাতীয় কৃষি গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক বন্যা ও খরা সহনশীল জাতের ফসল উদ্ভাবন ও প্রসার এবং প্রধান ফসলসমূহের উৎপাদন প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং

৩) স্বাভাবিকভাবে বন্যামুক্ত বছরে ভিটিস্থানে ফলমূল শাকসজি চাষাবাদ, সামাজিক বনায়ন, পশুপালন এবং বসতবাড়ীতে হাঁস-মুরগী খামার স্থাপনসহ বসতবাড়ীতে বাগান উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ।

২.১.২ সরকারী মজুদ হতে জরুরী বিতরণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত জরুরী খাদ্য পরিস্থিতির প্রয়োজনে সরকারী খাদ্য মজুদ হতে খাদ্য বিতরণের মাধ্যমে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দুর্যোগকবলিত এলাকায় সরকারী বিতরণ খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে এবং যোগান ও চাহিদার ভারসাম্যহীনতা নিরসনপূর্বক বাজার মূল্য স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে।

দুর্যোগ কবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জরুরী খাদ্য প্রয়োজন মেটাতে সরকারের নীতি হবে ঃ

১) দুর্যোগের সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে দ্রুত খাদ্য বিতরণ নিশ্চিতকরণ ;
২) নিয়মিত খাদ্যভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় মজুদ সংরক্ষণ ছাড়াও ন্যূনপক্ষে ৩ (তিন) মাসের জরুরী খাদ্য বিতরণ চাহিদা পরিপূরণে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত মজুদ সংরক্ষণ ;
৩) কোন একটি নির্দিষ্ট দেশ থেকে খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি-হ্রাসের জন্য সরকারী বাণিজ্যিক আমদানি (তবে অধিক আমদানি পরিহারের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনসহ)-র ক্ষেত্রে উৎস বহুমুখীকরণ ; এবং
৪) পদ্ধতিগত অপচয় হ্রাস এবং দক্ষ মজুদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারের সার্বিক খাদ্য বিতরণ ব্যয় হ্রাসকরণ।

২.১.৩. বেসরকারী কারবার এবং মজুদের মাধ্যমে যোগান বৃদ্ধির পদক্ষেপ ঃ

খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ উদারীকরণের মাধ্যমে সরকার উৎপাদন ঘাটতিকালে স্থানীয় যোগানের স্বল্পতা মেটাতে বেসরকারী খাতে খাদ্যশস্যের আমদানি উৎসাহিত করে।

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ঘাটতি পরিপূরণে এবং অর্থনৈতিকভাবে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে সরকার ঃ

১) খাদ্যের মজুদ এবং চলাচলে প্রতিবন্ধকতা অপসারণ নিশ্চিত করবে ;
২) গুদামজাতকরণ এবং মজুদ সংরক্ষণের জন্য ঋণ সুবিধাদি প্রদান করবে;
৩) দক্ষ গুদামজাতকরণে এবং বিতরণ কৌশল উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করবে;
৪) অস্বাভাবিক ভাবে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধিজনিত সমস্যা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাণিজ্য এবং আর্থিক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারী আমদানি উৎসাহিত করবে ; এবং
৫) বেসরকারীখাতের মাধ্যমে দ্রুত এবং দক্ষভাবে খাদ্য সরবরাহের জন্য সরকারী গুদাম ও অন্যান্য পরিচালন সুবিধাদি যৌক্তিক মূল্যে বেসরকারী পর্যায়ে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করবে।

কৌশল -২.২ . খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে লক্ষ্যমুখী খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির ফলপ্রদ বাস্তবায়ন

বছরব্যাপী চরম পুষ্টি ঝুঁকির সম্মুখীন অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেসরকারী খাদ্যবাজার থেকে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা অপর্যাপ্ত। অধিকন্তু, দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করায় অনেক পরিবারই মৌসুমী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয় অর্থাৎ তারা মন্দা মৌসুমে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও বঞ্চনার শিকার হয়। অন্য পেশার জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দিন মজুর, জেলে এবং মাঝিগণও অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও সময়ের সাথে স্থান পরিবর্তনের কারণে দুস্থতায় পতিত এবং বেশীমাত্রায় পুষ্টি ঝুঁকির সম্মুখীন পরিবারসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক একটি দক্ষ লক্ষ্যমুখী কর্মসূচি (স্বচ্ছল সদস্যদের সুবিধা প্রদান না করে) পরিচালনার মাধ্যমে লক্ষ্য-জনগোষ্ঠীর প্রকৃত আয় ও খাদ্য ভোগের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করা যায়। তাই একটি সফল লক্ষ্যমুখী কার্যক্রমে লক্ষ্যবহির্ভূত পরিবারের মাঝে বেহাত হওয়া (leakage) হ্রাস করা অপরিহার্য। বেহাতের ফলে লক্ষ্যমুখী হস্তক্ষেপের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ব্যয়-সাশ্রয় হ্রাস পায়। দুস্থ জনগোষ্ঠীর মাঝে শহর এলাকার বস্তিবাসী এবং গ্রামের ভূমিহীনরাই চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। আয়ের সীমাবদ্ধতা এবং নিম্নমানের পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার কারণে শহরের বস্তিবাসীদের পুষ্টিহীনতা খুবই প্রকট। গ্রামীণ দুস্থ জনগোষ্ঠীর মাঝে পুষ্টিহীনতা ভূমিহীন পরিবার ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রকটভাবে বিস্তৃত। এছাড়া বৃদ্ধ, স্বামীবঞ্চিত, অসহায় বিধবা, প্রতিবন্ধী সদস্য নিয়ে গঠিত আরও কিছু দরিদ্র পরিবারের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারিত হওয়া দরকার।

ভৌগলিক নিশানা (geographic targeting)-র মাধ্যমে দেশের সুনির্দিষ্ট দুস্থ জনপূর্ণ এলাকাসমূহে লক্ষ্যমুখী হস্তক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব, নিম্নমানের অবকাঠামো ও কৃষি উন্নয়ন এবং বিশেষভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ সকল বিবেচনায় বন্যাপ্রবণ এলাকা বিশেষতঃ প্রধান প্রধান নদী তীরবর্তী ভাংগন এলাকা এবং শহরের বস্তিসমূহ দেশের সবচেয়ে পুষ্টিগতভাবে দুস্থ এলাকা হিসেবে গণ্য। তাই বাংলাদেশ সরকার প্রকট পুষ্টিহীনতা বিরাজমান এমন জনগোষ্ঠী, অঞ্চল এবং মৌসুমে আয়-বন্টন, লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ এবং গণপূর্ত কর্মসূচির মাধ্যমে লক্ষ্যমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। দরিদ্র পরিবারের খাদ্যপ্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে সরকারী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় সরকার নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে ঃ

১) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবারসমূহের মধ্যে সরাসরি জরুরী ত্রাণ বিতরণ ;
২) দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সরবরাহ (ভিজিএফ) কর্মসুচির আওতায় দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে যৌক্তিক সময় পর্যন্ত লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ ;
৩) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচির আওতায় পারিশ্রমিক হিসেবে খাদ্যশস্য বিতরণ;
৪) প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সরাসরি বিতরণ (যেমন - মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত দুস্থ জনগোষ্ঠী উন্নয়ন -VGD কর্মসূচি বাস্তবায়ন) এবং
৫) অতি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ ও ফলপ্রদ বাস্তবায়ন।

কৌশল -২.৩. কর্মসংস্থানমূলক আয় বৃদ্ধি

স্বল্পমেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমানে পরিচালিত সরকারী ও এন.জি.ও কর্মসূচিসমূহ যদিও দরিদ্র পরিবারসমূহের বাড়তি খাদ্য প্রাপ্তি ও আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে, তবে দীর্ঘমেয়াদে শ্রমনিবিড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই দেশের সকল পরিবারের জন্য বিস্তৃত ভিত্তিতে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রধান উপায় হতে পারে। যেহেতু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভূমি ও মূলধনে প্রবেশাধিকার সীমিত, সেহেতু কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়টিতে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। অধিকাংশ দরিদ্র জনগণ পল্লী এলাকায় বসবাসের কারণে বাংলাদেশে টেকসইভাবে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পূর্বশর্ত হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধি। পরিবারপর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তার মাত্রা উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা, মৌলিক সম্পদ (মহিলাদের খাস জমি প্রাপ্তি সুবিধাসহ) এবং বিশেষতঃ দরিদ্র মহিলাদের জন্য ঋণসুবিধা প্রদান। শস্য, পশুসম্পদ (পোল্ট্রিসহ) ও শস্য-বহির্ভূত পণ্য উৎপাদন ও

বিপণন কার্যক্রমে (যার জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে চাহিদা বর্তমানে বিদ্যমান) মহিলাকেন্দ্রিক উদ্যোগসমূহ অগ্রাধিকার পাবে।

বাংলাদেশ সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধির জন্য বহু উন্নয়নমূলক নীতি ও প্রকল্প হাতে নিয়েছে তন্মধ্যে উলেখযোগ্য হল-

১) মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;
২) কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;
৩) কৃষিভিত্তিক শিল্প উন্নয়নে উৎসাহদায়ক সুবিধা প্রদান;
৪) গ্রামীণ শিল্পের প্রসারে বিশেষ সহায়তা;
৫) শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি এবং
৬) ব্যাপকভিত্তিক প্রবৃদ্ধি প্রসারে সামষ্টিক নীতি গ্রহণ।

২.৩.১ মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সহায়তা

খাদ্য নিরাপত্তায় মহিলাদের অবদান প্রায়শই মূল্যায়িত হয় না। তারা পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টির উৎস সংগতিপুর্ণভাবে বজায় রাখার জন্য সর্বদা প্রাণান্ত চেষ্টারত। পরিবারের কল্যাণে ক্রমবর্ধমান দায়িত্বশীলতার কারণে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীরা কার্যকর মাধ্যম (effective vehicle) হিসেবে বিবেচিত। অন্তঃপরিবার খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের পুষ্টিবস্থা নির্ধারণে নারীরা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

উৎপাদনবর্ধক সম্পদের প্রাপ্তি সুবিধাসহ উপকরণ ও সেবামূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অধিকহারে অন্তর্ভুক্তিসহ নারীভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। সম্প্রসারণ সেবা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ঋণ এবং প্রযুক্তিতে নারীদের প্রবেশাধিকার কম। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তায় প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের অধিকতর অবদানের এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এ সকল বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের লক্ষ্য হবে -

১) কৃষিখাতে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রসার এবং গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন কর্মকান্ডে সুযোগ এবং কৌশল সরবরাহ;
২) প্রতিবন্ধী ও নারীনির্ভর লক্ষ্যমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ঋণ, নতুন প্রযুক্তিসহ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিক্ষম সম্পদের উপর মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ ; এবং
৩) অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ করার জন্য নারীসম্পৃক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রবর্তন এবং
৪) পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণের জন্য মহিলাদের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে যথাযথ সহায়ক উদ্যোগ গ্রহণ।

২.৩.২ কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমূলক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ

প্রযুক্তি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে কিন্তু তা সাধারণত মূলধননিবিড় এবং শ্রমিক প্রতিস্থাপক হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থা সচরাচর হয় না। তবুও উৎপাদন পদ্ধতির সাথে শ্রম নিবিড় প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটে এমন প্রযুক্তির নির্বাচন বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিৎ। উদাহরণস্বরূপ উচ্চ-ফলনশীল ধান চাষাবাদের উলেখ করা যায়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণ ও উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব প্রায়শঃই উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

২.৩.৩ কৃষিভিত্তিক শিল্প উন্নয়নে উৎসাহদায়ক সুবিধা

কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন বহুমুখী কৃষিকে পশ্চাদযোগ শিল্পে পরিণত করে গ্রামীণ দরিদ্রদের আয় বাড়াতে সাহায্য করে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের বর্তমান অনগ্রসরতার প্রেক্ষাপটে এখাতে ঋণসহ আর্থিক সুবিধাভিত্তিক বিশেষ উৎসাহমূলক সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রবৃদ্ধির স্বার্থে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়ন সহায়তাসহ গ্রামীণ বাজারের সাথে শহর, আঞ্চলিক ও বিশ্ববাজারের সাথে যোগসূত্র স্থাপন, পরিবহন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাদির সহজলভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩.৪. গ্রামীণ শিল্পের প্রসারে বিশেষ সহায়তা

গ্রামীণ শিল্পের প্রসারের স্বার্থে (বিশেষতঃ যে সকল এলাকা এক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ) যথাযথ উৎসাহমূলক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনামূলক সরকারী সহায়তা (যথা -গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র বীমা পদ্ধতিতে আংশিক প্রিমিয়াম সহায়তা) প্রদান করার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে মহিলা পরিচালনাধীন শ্রমনিবিড় গৃহভিত্তিক উদ্যোগকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা দরকার।

২.৩.৫. শিক্ষা, দক্ষতা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন

মৌলিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা হচ্ছে প্রযুক্তি গ্রহণের পূর্বশর্ত। শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী খাতে বর্তমানে পরিচালিত কর্মসূচিসমূহকে শ্রমবাজারের চাহিদার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত। এক্ষেত্রে বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি সম্ভাবনা অন্বেষণসহ জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনে দক্ষ শ্রমিকের প্রকারভেদে বাজার চাহিদা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নির্ধারণকল্পে একটি জরিপ পরিচালনা করা আবশ্যক।

২.৩.৬. শ্রমনিবিড় প্রবৃদ্ধির প্রসারে সামষ্টিক নীতি গ্রহণ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকলের আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। সামষ্টিক অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শ্রমবাজার সৃষ্টিসহ আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্রুত আয় বৃদ্ধিই সরকারী নীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর এজন্য গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য ঋণসুবিধা, ভূমি ও মূলধনে দরিদ্র জনগণের ক্ষমতায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন - যা প্রকারান্তরে সমাজের বয়োঃবৃদ্ধ, দুস্থ-মহিলা, ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

বিপণন কার্যক্রমে (যার জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে চাহিদা বর্তমানে বিদ্যমান) মহিলাকেন্দ্রিক উদ্যোগসমূহ অগ্রাধিকার পাবে।

বাংলাদেশ সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধির জন্য বহু উন্নয়নমূলক নীতি ও প্রকল্প হাতে নিয়েছে তন্মধ্যে উলেখযোগ্য হল-

১) মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;
২) কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;
৩) কৃষিভিত্তিক শিল্প উন্নয়নে উৎসাহদায়ক সুবিধা প্রদান;
৪) গ্রামীণ শিল্পের প্রসারে বিশেষ সহায়তা;
৫) শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি এবং
৬) ব্যাপকভিত্তিক প্রবৃদ্ধি প্রসারে সামষ্টিক নীতি গ্রহণ।

২.৩.১ মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সহায়তা

খাদ্য নিরাপত্তায় মহিলাদের অবদান প্রায়শই মূল্যায়িত হয় না। তারা পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টির উৎস সংগতিপুর্ণভাবে বজায় রাখার জন্য সর্বদা প্রাণান্ত চেষ্টারত। পরিবারের কল্যাণে ক্রমবর্ধমান দায়িত্বশীলতার কারণে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীরা কার্যকর মাধ্যম (effective vehicle) হিসেবে বিবেচিত। অন্তঃপরিবার খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের পুষ্টিবস্থা নির্ধারণে নারীরা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

উৎপাদনবর্ধক সম্পদের প্রাপ্তি সুবিধাসহ উপকরণ ও সেবামুলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অধিকহারে অন্তর্ভুক্তিসহ নারীভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। সম্প্রসারণ সেবা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ঋণ এবং প্রযুক্তিতে নারীদের প্রবেশাধিকার কম। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তায় প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের অধিকতর অবদানের এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এ সকল বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের লক্ষ্য হবে -

১) কৃষিখাতে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রসার এবং গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন কর্মকান্ডে সুযোগ এবং কৌশল সরবরাহ;
২) প্রতিবন্ধী ও নারীনির্ভর লক্ষ্যমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ঋণ, নতুন প্রযুক্তিসহ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিক্ষম সম্পদের উপর মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ ; এবং
৩) অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ করার জন্য নারীসম্পৃক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রবর্তন এবং
৪) পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণের জন্য মহিলাদের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে যথাযথ সহায়ক উদ্যোগ গ্রহণ।

২.৩.২ কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমূলক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ

প্রযুক্তি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে কিন্তু তা সাধারণত মূলধননিবিড় এবং শ্রমিক প্রতিস্থাপক হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থা সচরাচর হয় না। তবুও উৎপাদন পদ্ধতির সাথে শ্রম নিবিড় প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটে এমন প্রযুক্তির নির্বাচন বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিৎ। উদাহরণস্বরূপ উচ্চ-ফলনশীল ধান চাষাবাদের উলেখ করা যায়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণ ও উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব প্রায়শঃই উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

২.৩.৩ কৃষিভিত্তিক শিল্প উন্নয়নে উৎসাহদায়ক সুবিধা

কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন বহুমুখী কৃষিকে পশ্চাদযোগ শিল্পে পরিণত করে গ্রামীণ দরিদ্রদের আয় বাড়াতে সাহায্য করে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের বর্তমান অনগ্রসরতার প্রেক্ষাপটে এখাতে ঋণসহ আর্থিক সুবিধাভিত্তিক বিশেষ উৎসাহমূলক সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রবৃদ্ধির স্বার্থে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়ন সহায়তাসহ গ্রামীণ বাজারের সাথে শহর, আঞ্চলিক ও বিশ্ববাজারের সাথে যোগসূত্র স্থাপন, পরিবহন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাদির সহজলভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩.৪. গ্রামীণ শিল্পের প্রসারে বিশেষ সহায়তা

গ্রামীণ শিল্পের প্রসারের স্বার্থে (বিশেষতঃ যে সকল এলাকা এক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ) যথাযথ উৎসাহমূলক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনামূলক সরকারী সহায়তা (যথা -গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র বীমা পদ্ধতিতে আংশিক প্রিমিয়াম সহায়তা) প্রদান করার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে মহিলা পরিচালনাধীন শ্রমনিবিড় গৃহভিত্তিক উদ্যোগকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা দরকার।

২.৩.৫. শিক্ষা, দক্ষতা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন

মৌলিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা হচ্ছে প্রযুক্তি গ্রহণের পূর্বশর্ত। শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী খাতে বর্তমানে পরিচালিত কর্মসূচিসমূহকে শ্রমবাজারের চাহিদার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত। এক্ষেত্রে বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি সম্ভাবনা অন্বেষণসহ জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনে দক্ষ শ্রমিকের প্রকারভেদে বাজার চাহিদা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নির্ধারণকল্পে একটি জরিপ পরিচালনা করা আবশ্যক।

২.৩.৬. শ্রমনিবিড় প্রবৃদ্ধির প্রসারে সামষ্টিক নীতি গ্রহণ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকলের আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। সামষ্টিক অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শ্রমবাজার সৃষ্টিসহ আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্রুত আয় বৃদ্ধিই সরকারী নীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর এজন্য গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য ঋণসুবিধা, ভূমি ও মূলধনে দরিদ্র জনগণের ক্ষমতায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন - যা প্রকারান্তরে সমাজের বয়োঃবৃদ্ধ, দুস্থ-মহিলা, ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

উদ্দেশ্য -৩. সকলের (বিশেষতঃ নারী ও শিশুর) জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি বিধান

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আপদকালীন ঘাটতি ও অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশ উলেখযোগ্যভাবে সফল হলেও দেশের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাঝে পুষ্টি সমস্যা প্রকটভাবে বিদ্যমান। অন্যান্য কর্মসূচির সাথে সরকার জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি (১৯৯৭) এবং পুষ্টি সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (১৯৯৭) অনুমোদন করেছে। জাতীয় পুষ্টি পরিষদ সক্রিয়করণসহ বৃহৎ পরিসরে পুষ্টি এবং খাদ্য ব্যবহারের সমস্যা সংশিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনায় সরকার জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের আলোকে প্রণীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রেও পুষ্টি বিষয়কে অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে সরকার গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচিসমূহকে কার্যকরভাবে অঙ্গীভূতকরণ। খাদ্যের ব্যবহার এবং পুষ্টি, বিশেষতঃ দুস্থ ব্যক্তির (দরিদ্র মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধী) জন্য পর্যাপ্ত মুখ্য পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ (ক্যালরী, আমিষ, চর্বি ও তেল) খাদ্য ভোগ, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য কর্মসূচি, পুষ্টি শিক্ষা ও তথ্য বিতরণ সার্বিক পুষ্টি অবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। সর্বোপরি রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, পানি এবং পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার বাইরে বৃহৎ পরিসরে স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নয়ন কর্মসূচিও অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

কৌশল ৩.১ স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি গঠনে সুষম খাদ্যের সংস্থানকল্পে সুদূরপ্রসারী জাতীয় পরিকল্পনা

উন্নত জাতি হিসেবে দেশকে গড়ে তুলতে দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থসম্পন্ন মানব সম্পদের উন্নয়ন আবশ্যক। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পারিবারিক আয়ের পরিবর্তন তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে খাদ্য চাহিদার পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সংশিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি গঠনে খাদ্যাভ্যাস পরিবতর্নের নিমিত্তে চালের উপর নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনে সুষম খাদ্যের সংস্থানকল্পে সুদূরপ্রসারী জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করবে ঃ

৩.১.১. স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি গঠনে শারীরিক সামর্থ্যের প্রয়োজনে সুদূরপ্রসারী লক্ষমাত্রা নির্ধারণ

১) সার্বিক পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে শারীরিক সামর্থ্যের প্রয়োজনে সুদূরপ্রসারী লক্ষমাত্রা নির্ধারণ এবং
২) খাদ্য চাহিদার পর্যায়ক্রমিক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে খাদ্য প্রাপ্তি সংশিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ।

৩.১.২. দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য গ্রহণের মাত্রা নির্ধারণ

১) স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি গঠনকল্পে সুষম খাদ্য সংস্থানের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং
২) শারীরিক গঠন ও পেশাভেদে সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীতার নিরিখে জনপ্রতি গড় ক্যালরী চাহিদা নির্ধারণ।

৩.১.৩. প্রয়োজনীয় পুষ্টিচাহিদা পরিপূরণে সুষম খাদ্য সংস্থানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ

১) সুষম খাদ্য গ্রহণের কাঙ্খিত লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে অর্জনে সংবলিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং
২) খাদ্য ভোগের উপর নিয়মিত সমীক্ষার ভিত্তিতে বাংলাদেশের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ফুড ব্যালান্স শীট প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ ।

৩.১.৪. স্বল্পতম ব্যয়ে সুষম খাদ্য সংস্থানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ

১) "সুষম খাদ্যভোগে সহায়ক" স্বল্পব্যয় সম্বলিত স্থানীয় মেনুভিত্তিক খাদ্য তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং
২) স্বল্পব্যয় সম্বলিত সুষম খাদ্যের স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদনের মাধ্যমে প্রাপ্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।

কৌশল -৩.২. দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ

খাদ্য নিরাপত্তা নীতির প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে পুষ্টিদায়ক খাদ্য (যেমন- ক্যালারী, আমিষ, চর্বি এবং তৈল ইত্যাদি) ভোগের নিশ্চয়তা প্রদান। দুস্থ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে প্রতিবন্ধী, শিশু ও নারী (বিশেষতঃ কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মাতা)-দের পুষ্টির জন্য পর্যাপ্ত শর্করা, আমিষ, চর্বি ও তৈল সমৃদ্ধ খাদ্য প্রাপ্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মুখ্য খাদ্য উপাদান (ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট) সমৃদ্ধ খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ নিশ্চিতকল্পে সরকারের নীতি হবে এনজিও এবং উন্নয়নসহযোগীদের সাথে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে কাজ করা ঃ

১) দুস্থ জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তি চিহ্নিত করণ ও খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে পুষ্টি ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ এবং গোষ্ঠী পর্যায়ে উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণ ; এবং
২) প্রতিবন্ধী সহায়ক শিক্ষা সুবিধা, মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, ক্ষুদ্র-ঋণ, দুস্থ জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দুস্থ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন।

কৌশল -৩.৩. পর্যাপ্ত মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সম্পন্ন সুষম খাদ্য

বাংলাদেশের জনগণের জন্য স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত শর্করা ,আমিষ, তৈল ও চর্বি, সমৃদ্ধ খাদ্যের পাশাপাশি লৌহ ও ভিটামিন এ' ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে স্বল্প ব্যয়ের জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি ও পুষ্টিশিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ ছাড়াও অপর সম্ভাবনাময় ও টেকসই পদ্ধতি হল প্রচলিত উদ্ভিদ প্রজননে জৈব দৃঢ়ীকরণের মাধ্যমে প্রধান খাদ্যশস্যে লৌহ ও ভিটামিন এ' সমৃদ্ধকরণ। অন্তর্বর্তী সময়ে ব্যয়-সাশ্রয়ী কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে খাদ্যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পরিপূরণ ও সংযুক্তিকরণের (প্রতিষ্ঠিত যথাযথ গুণমান ও আইনগত ভিত্তিসহ) কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টজনিত অপুষ্টির সুদূরপ্রসারী ক্ষতি বিবেচনা করে খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি ছাড়াও সরকার নিম্নোক্তভাবে পুষ্টির অভাব ও অসম পুষ্টিমান বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে -

৩.৩.১ পুষ্টি-শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি - যার মধ্যে

১) সুষম খাদ্যগ্রহণ প্রসারকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার ও গণমাধ্যমে সুষম খাদ্য বিষয়ে নির্দেশনামূলক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ ;
২) বিশেষতঃ পল্লী এলাকায় গোষ্ঠী পর্যায়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনমূলক কার্যকর প্রচার কর্মসূচি নিবিড়করণ এবং
৩) পুষ্টি-শিক্ষা বিষয়ে আদর্শ মডিউল উন্নয়নসহ বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচিতে তা অন্তর্ভুক্তিকরণ।

৩.৩.২ খাবার বহুমুখীকরণ

১) উৎপাদনকারী পর্যায়ে ও বাজারে সব্জি প্রাপ্যতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বহুমুখী পুষ্টিদায়ক খাবার গ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বসতবাড়িতে সব্জি বাগান ও হাঁসমুরগী পালন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদান।

৩.৩.৩ ফলপ্রসূ খাদ্য পরিপূরণ এবং সুরক্ষাকরণ (food supplementation and fortification)

১) আটা (খোসাসহ গমের ময়দা) এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্য সুরক্ষাকরণ (fortification);
২) মানুষ ও পশুর ব্যবহারোপযোগী লবণকে বাধ্যতামূলকভাবে আয়োডাইজেশন (iodisation) এবং
৩) পুষ্টি এবং খাদ্যবিষয়ক হস্তক্ষেপ কর্মসূচির মাধ্যমে সম্পূরক (supplementary) খাদ্য সরবরাহকরণ ।

কৌশল -৩.৪. নিরাপদ খাবার পানি এবং উন্নত পয়ঃনিস্কাশন

বর্তমানে ডায়রিয়াসহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগের প্রকোপ ব্যাপকতর হওয়ায় নিরাপদ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা এদেশের পুষ্টিমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে বিদ্যমান ও পরিকল্পিত সুবিধাদির মধ্যে পানির গুণাগুণ পরীক্ষাকরণ (বিশেষতঃ খাবার পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ধারণ) ও সীমিতকরণের প্রচেষ্টা সর্বাধিক গুরুত্বহ।

নিরাপদ পানি এবং পয়ঃনিস্কাশন উন্নয়নে সরকারের নীতি এবং কর্মসূচি নিম্নরূপ ঃ

১) স্বাস্থ্য শিক্ষা যার মধ্যে শিশুদের সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা এবং নিরাপদ পানীয় জল এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য পয়ঃনিস্কাশন পদ্ধতির ব্যবহারের গুরুত্ব অন্তর্ভুক্তি ;
২) পানি সরবরাহ (কমিউনিটি টিউবওয়েল) এবং পয়ঃনিস্কাশনে বিনিয়োগসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং
৩) পানির গুণাগুণ (বিশেষত আর্সেনিকের মাত্রা) পরীক্ষাকরণ ও বিদ্যমান সরকারী সুবিধাদির সম্প্রসারণ।

কৌশল -৩..৫. নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য সরবরাহ

বর্তমান সময়ে নিরাপদ খাদ্যের লভ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে প্রসারমান তৈরি খাদ্যসহ সকলপ্রকার মানসম্পন্ন খাদ্যের বাজরজাতকরণ সুবিধাদি উন্নয়নসহ গুণগতমান রক্ষণের জন্য বিপণন কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে (যথা- একত্রীকরণ, পরিচালন, বিন্যাসকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোড়কীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে) যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র আওতায় SPS (sanitary and phytosanitary), TBT (technical barrier to trade) চুক্তি স্বাক্ষরদাতা এবং *কোডেক্স এলিমেন্টারীয়াস* কমিশনের সদস্য। উৎপাদন পর্যায় থেকে খাবার গ্রহণ পর্যায় পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ঝুঁকি নিরূপণ ও রোধকরণ পদ্ধতি প্রাধান্য পেতে পারে। এজন্য বিদ্যমান বিধিবিধান যথাযথভাবে সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগী বিধিবিধান প্রণয়ন এবং বেসরকারী খাতের উদ্যোগকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য সরবরাহ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সমূহ গ্রহণ করা হবে ঃ

১) খাদ্যজাত পণ্যের সমরূপ বিন্যাস, মান পদ্ধতির উন্নয়ন, মানদন্ড প্রণয়ন, আরোপ ও বাধ্যতামূলক প্রয়োগ ;
২) প্যাকিং বা মোড়কীকরণ পদ্ধতি উন্নয়নসহ নিরাপদ গুদামজাতকরণ সুবিধাদিতে বিনিয়োগ ;
৩) খাদ্য ও খাদ্যজাত পণ্যের গুণাগুণ উন্নয়নে গবেষণাগারের সুবিধা ও প্রযুক্তিনির্ভর বাস্তবজ্ঞান প্রদান ;
৪) খাদ্যজাত পণ্যের গুণাগুণ ও মান প্রতিপালনে সংশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থাকে প্রশিক্ষণ প্রদান ;
৫) পুষ্টি উন্নয়নকারী মানসম্পন্ন এবং নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে প্রচার ; এবং
৬) খাদ্য উৎপাদন ও বাজার প্রক্রিয়ায় ক্ষতিকর সংযোজন দ্রব্য, সংরক্ষণ দ্রব্য এবং বিষাক্ত দ্রব্যের নির্বিচার ব্যবহার রোধকল্পে নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ ।

কৌশল -৩.৬. পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যমান

রোগ নিয়ন্ত্রণ শুধু পুষ্টি উন্নয়নেই অবদান রাখে না, সার্বিক স্বাস্থ্যমান উন্নয়নেও সহায়তা করে। পুষ্টি ও খাদ্যের সঠিক জৈবিক ব্যবহার বিষয়ে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেবা প্যাকেজ (HNPSP)-সহ এনজিও তথা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও সমম্বয়ে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেবা প্যাকেজে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

১) সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ই.পি.আই), শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত জটিল ক্ষত নিয়ন্ত্রণ (এ.আর.আই), কলেরা এবং আন্ত্রিক রোগসমূহ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
২) প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং
৩) এনজিওসমূহের মাধ্যমে শিশু ও সক্ষম নারীদের ক্রমাগত দুর্বলতা এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের অভাবজনিত রোগ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিসহ গোষ্ঠীভিত্তিক পুষ্টিসেবা বিতরণকল্পে জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প বাস্তবায়ন ।

ঙ. খাদ্যনীতি গবেষণা, বিশেষণ এবং সমন্বয়

খাদ্য নিরাপত্তায় সকল আঙ্গিক (যথা- খাদ্যের লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার) একত্রিত হওয়ায় খাদ্যনীতি ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা নীতির এসকল আঙ্গিক সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংশিষ্ট কার্যক্রম দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। বিশ্ববাণিজ্য ও খাদ্য সাহায্যের পরিবেশ পরিবর্তনের দ্বারা বর্তমান নীতি-কৌশল প্রভাবিত হচ্ছে যা খাদ্যনীতিকে ভবিষ্যতের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকগণ কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং কার্যাবলী সমন্বিতকরণে বাধার সম্মুখীন হতে পারে। খাদ্যনীতি কাঠামোর আওতায় জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নবিষয়ক কার্যাবলীর সমন্বয় করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি-কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় ও অনান্য পর্যায়ের কর্তৃপক্ষই সুসমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

খাদ্যনীতি প্রণয়ন বা হালনাগাদকরণ ও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য নীতি-নির্ধারকগণ কর্তৃক বিকল্পসমূহ সম্পর্কে সুক্ষভাবে মর্ম উপলব্ধি করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য পন্থাসমূহের বিবরণসহ ইপ্সিত ফলাফল হাতে থাকতে হবে। এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট চিত্র সৃষ্টির জন্য (ক) তথ্য সরবরাহের ধারাবাহিকতা বজায়; (খ) তথ্যসমূহের বিশেষণ; (গ) খাদ্য নিরাপত্তা পরিবেশের গতি প্রকৃতির পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা; (ঘ) পর্যাপ্ত সংখ্যক বিকল্প; (ঙ) স্থানীয় ও বিশ্ববাজারে খাদ্য সরবরাহ ও বাণিজ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পূর্বাভাস ইত্যাদি আবশ্যক। খাদ্যনীতি বিশেষক ও গবেষকগণ ক্রমাগতভাবে গবেষণা ও বিশেষণের মাধ্যমে নীতি নির্ধারকদের জন্য ভবিষ্যতে সম্ভাব্য যে ধরনের তথ্যাদি প্রয়োজন হতে পারে তার আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সামগ্রিক খাদ্যনীতি কাঠামোর আওতায় খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়ন, সম্পদ আহরণ, সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সচল ও শক্তিশালীকরণ প্রয়োজন। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত "খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি" খাদ্যের ব্যবহার ও পুষ্টি বিষয়সহ সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা প্রচেষ্টাসমূহের পরিকল্পনা এবং ফলাফল পরিবীক্ষণ করবে। খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম সংশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় (যথাঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অর্থ, পরিকল্পনা, কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ, স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)-এর প্রতিনিধি এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে - যেখানে খাদ্যনীতির সকল আঙ্গিকের অগ্রগতির বিষয় আলোচিত হবে এবং খাদ্যনীতি বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নিদের্শনা দেয়া হবে।

চ. উপসংহার

খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য লভ্যতা অপরিহার্য হলেও পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তার উলেখযোগ্য উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি ও খাদ্যের যথাযথ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পুষ্টি বিধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ কৃষিতে দক্ষতা অর্জনসহ শস্য ও অশস্য খাদ্যের লভ্যতা বৃদ্ধি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় টেকসইভাবে বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা অর্জন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে অপুষ্টির শিকার ব্যক্তির খাদ্যের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা সুসংহতকরণ সম্ভব। আশা করা যায় যে, প্রণীত খাদ্যনীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জনগণ তাদের কাঙ্খিত খাদ্য নিরাপত্তা ভোগ করতে সক্ষম হবে। এ নীতির সাথে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিমূলক অন্যান্য নীতি-কৌশল সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনবোধে সরকারী আদেশ জারির মাধ্যমে প্রণীত নীতি বাস্তবায়নোপযোগী করা হবে।